Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফের কয়েকটি সাক্ষাৎকার

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আফজালুল বাসার
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.10
Pages	97-110
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহমদ শরীফের কয়েকটি সাক্ষাৎকার

আফজালুল বাসার*

এই রচনাটিতে আহমদ শরীফের প্রকাশিত বিভিন্ন সাক্ষাৎকার অবলম্বন করে তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

জাগতিকতা

অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাংলাদেশে জাগতিক চিন্তার অন্যতম অগ্রপথিক। তিনি তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে জাগতিক চিন্তাকে বিকশিত করেছিলেন। ছোটবেলাতেই তাঁর মধ্যে জাগতিক চিন্তার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সনে আবুল আহসান চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন : "আমার নাস্তিক্যবোধের জন্ম হলো একেবারে গোড়া থেকে।... আমি স্কুলের ছাত্র। বোধ হয় ক্লাস এইট।.... আমি নামাজ পড়েছি। এমনকি আগে গিয়ে আমাদের নিজেদের মসজিদে মোয়াজ্জিনের আগে আগে আমি আজান দিতে আনন্দ পেতাম। সেরকম এক সময় গেছে আমার।... তাহাজ্জোতের নামাজও পড়েছি মাস দেড় মাস।... ধর্মটা সত্যি যাচাই করার জন্যে কোরান পড়েছি। আমি আরবি জানি না—ইংরেজিতে কোরান সবচেয়ে ভালো তর্জমা মওলানা মোহাম্মদ আলীর, খুব লারনেড লোক, আরও মওলানা ইউসুফ আলীর—তাঁর সুন্দর ট্রানশ্লেশন—বাইবেলের মতো ভাষা, আমি পড়েছি। তারপর বাইবেল পড়লাম। তারপর বেদ পড়লাম—উপনিষদ পড়লাম—দেখি যে, কোনো দুটি মেলেনা। এবং কোনো রিজন নেই। এগুলো দেখে শুনে বুঝে তোমাকে কেমনে বলি—আমি আস্তিক থাকতে পারলাম না। আমি আস্তিক থাকার জন্যে দেখলাম—দেখি যে বোগাস! এমন বোগাস যে অনর্থক মানুষ ভোগে।"

কিন্তু এই যে জাগতিক চেতনায় উত্তরণ এটা ঠিক কবে কিভাবে ঘটল এবং এর উপাদানই বা কি? আপাতত তথ্যের অভাবে সঠিক সময় নিরূপণ করা গেল না। তবে এইটুকু হয়ত বলা যায়, ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে যে ঔৎসুক্য এবং কৌতূহল জাগ্রত ছিল তারই ধারায় ক্রমে তার মধ্যে জাগতিকতা গড়ে উঠেছে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সর্বাঙ্গে জাগতিক; জীবনে এবং মৃত্যুতে জাগতিক। কথা আছে, মানুষ জন্মায় মুক্তভাবে কিন্তু পরে সে হয় শৃঙ্খলিত; অধ্যাপক আহমদ শরীফও মুক্তভাবে জন্মেছেন, কিন্তু তারপর ক্রমশ শৃঙ্খলতি না হয়ে অনেক দিক দিয়ে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর ঐ

---

* গবেষক।

সাক্ষাৎকারেই বলেছেন, "আই ওয়াজ বর্ন অব মুসলিম প্যারেন্টস। আমি তো মুসলমান মা বাপের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি ইসলাম গ্রহণও করিনি বর্জনও করিনি। একবার গ্রহণ করে ছেড়ে দিলে তারে কয় মুরতাদ।" শৈশব বা কৈশোরে বা জীবনের প্রথম অংশে কিছু আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত সারা জীবনই তিনি ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে দূরে ছিলেন, অনেক সামাজিক শৃঙ্খলে তিনি ধরা দেননি। অন্যদিকে অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যবোধ, সদাশয়তা, আতিথেয়তা, সহৃদয়তা, দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল কিংবদন্তীতুল্য।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের জাগতিকতার উপাদান কী? এর প্রথম উপাদান হলো যুক্তি। তিনি বলেছেন, "যুক্তি আমাকে প্রতারণা করে না। আলোতে মানুষ ভয় পায় না কেন? কারণ সে চোখে দেখে।" দ্বিতীয় উপাদান, একজন নাস্তিক তার বিবেককে প্রতারণা করেন না। জাগতিক ব্যক্তি জেনে বুঝে শুনে জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধির প্রসারতার মাধ্যমে তার মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটান। তিনি হবেন বিবেকবান। কিন্তু আস্তিকের মধ্যে এই গুণাবলি থাকে না। আস্তিক জীবনকে তুচ্ছ এবং পরকালকে উচ্চ ভাবে। তাই কাউকে ক্ষমা করতে পারে না। তার জীবন হয় সংকীর্ণ এবং যান্ত্রিক। একটি মতবাদের মধ্যে সীমিত থেকে তারাও যুক্তিবাদী হন। এটাকে তিনি বলেছেন রামমোহনী মুক্তবুদ্ধি। এই মুক্তবুদ্ধি ছিল ওয়াহাবিদের, ছিল শিখা গোষ্ঠীর। জাগতিক মানুষ নীতিবান, কল্যাণকামী। তাঁর কথা হচ্ছে, "নাস্তিক হলেই মানুষ নীতিবিহীন হয় না। নাস্তিকতার মাধ্যমেও মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে প্রত্যেক ধর্মকে স্বমহিমায় উন্নীত করা নয়। তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে।" (*ইত্তেফাক*, ২৪.২.১৯৭৪)। কাজেই তিনি মনে করেন, পুরোপুরি নাস্তিক না হলে তার পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। নাস্তিক হলে তার নিকট ধর্মবিষয়ক অধিবিদ্যার সমাপ্তি ঘটে। কমিউনিস্ট মাত্রই নাস্তিক। নাস্তিকরাই, জাগতিকরাই সম্প্রদায়-চেতনার সকল রকম ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। অতএব জাগতিক মানুষ সাহসী, যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল; মনুষ্যত্ব বিকাশে সক্রিয়।

১৫.২.১৯৮৫ তারিখে *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* হুমায়ুন আজাদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আহমদ শরীফ তাঁর জাগতিকতা বিষয়ক বিখ্যাত উক্তিটি করেন। তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি, কেননা বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির আধুনিকতার প্রগতির সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার, তার বিরুদ্ধে চিরকাল লিখেছি।" জাগতিকতার এই ভাবনা আমাদের নতুন ধরনের মানবতত্ত্বের সন্ধান দেয়। এই জাগতিক মানুষের যুক্তি হল কল্যাণধর্মে নিষিক্ত কিন্তু বিবেক ও বিবেচনাপ্রসূত। এর লক্ষ্য হল আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান, আত্মবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত আমি থেকে সামাজিক আমির দিকে নিয়ে যাওয়া। জৈবিক ও ক্ষুদ্র মানুষ থেকে সুন্দর ও বৃহত্তর মানুষের দিকে যাওয়া।

জানুয়ারি ১৯৯৩ সনে প্রথমা রায় মণ্ডলকে *কবিতীর্থের* জন্য দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর জাগতিক দর্শনের সারকথাটি ব্যক্ত করেছেন :

> নৃবিজ্ঞানীরা এবং দার্শনিকেরা বলেন, ভয় থেকেই ভগবানের উৎপত্তি। আত্মরক্ষার প্রয়াসে অজ্ঞ-অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভরসাজাত বিশ্বাস-সংস্কার থেকেই ভূত-প্রেত-পিশাচ-যক্ষ-রক্ষ-ড্রাগন প্রভৃতি মিত্র ও অরিদেবতা শক্তির অস্তিত্বচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। মন্দ এবং সৎ শক্তির প্রতীকরূপে অরি ও মিত্রদেবতার উদ্ভব। আদি ও আদিম মানবের সর্বপ্রাণবাদ, যাদু বিশ্বাস, টোটেম-ট্যাবু সংস্কার প্রভৃতির ক্রমবিকাশে মনন-মনীষার উৎকর্ষের ফলে মানুষ একেশ্বরবাদী এবং নাস্তিক হয়েছে। আর সমাজ মানুষকে দেশনা দানের, বিধি-নিষেধ করার নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজের অলিখিত সমষ্টির নাম হল শাস্ত্র। পরে সেগুলো লিখিতরূপ পেয়ে যায়। জন্মমুহূর্ত থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবেশে মগজধোলাই হয় বলেই বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্বে এবং অমরত্বে আহ্বান, মানুষের পরলোক প্রসৃত জীবনচেতনাই তাকে সারাজীবন আস্তিক রাখে। আসলে আজ অবধি কোন সৃষ্টি-স্রষ্টা-আত্মা সম্পর্কে কিছুই জানেও না, বোঝেও না, কেবল অনুমানে এবং আন্দাজে এসবের অস্তিত্বে আস্থা রাখে। প্রমাণ—ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ, তার স্থিতি কোথায়, তার সৃষ্টির আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি—এ সম্পর্কে পৃথিবীর কোনো দুটো শাস্ত্রের, কোনো দু'জন মনীষীর বা দার্শনিকের মধ্যে ঐক্য নেই। বরং মতের ও সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্যই বেশি। এ কারণেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে-দেশে, কালে-কালে ধর্মমতের জন্ম-মৃত্যু, উদ্ভব এবং বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বারবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে—মতৈক্য মেলেনি কোথাও। এতেই বোঝা যায় স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং শাস্ত্রতত্ত্ব দেশে-দেশে, কালে-কালে সামাজিক প্রয়োজনে বা যৌথজীবনে সহযোগিতায় ও নির্বিরোধ-নির্বিবাদ-নিরুপদ্রব-নির্বিঘ্ন-নিরাপদ সহাবস্থানের গরজে মানবহিতৈষী মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশে-দেশে, কালে-কালে, দেশ-কালের প্রয়োজনে তৈরি করেছেন ।...
>
> আমি জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা প্রভৃতি কোনকিছুর মূল্য ও পরিচিতি স্বীকার করি না। আমি মনে করি, জাতপাত প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে বৈশ্বিক মানবচেতনা অর্জনের ও দানের জন্য কেবল নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ, তার শেষ পরিচয়ও সে মানুষ। ইহুদি-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-মুসলমান থাকা মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষ হওয়াই তার লক্ষ্য বলে আমি মনে করি। এবং এজন্যে আজ অবধি তিনটে পন্থার অন্তত যে-কোনো একটি গ্রহণীয় বলে মনে করি—১. স্রষ্টা স্বীকার করেও শাস্ত্র না মানা; ২. নাস্তিক হওয়া; ৩. কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী কিংবা ইহজাগতিক সর্বপ্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাব-আচরণে সেক্যুলার হওয়া।

লোকসংস্কৃতি

জানুয়ারি ১৯৯৩ সনে প্রথমা রায় মণ্ডলকে দেওয়া উপর্যুক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বলেছেন যে, এক. গাঁয়ের মানুষেরা অশিক্ষিত থেকে লোকসংস্কৃতির চর্চা করতে থাকবে—এটা

অমানবিক চিন্তা। দুই. লোকসংস্কৃতিকে বর্তমান জীবনে অনুশীলনীয় উপাদান হিসেবে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা একটি ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। তিন. কিছু মানুষকে লোক, হরিজন আর কিছু মানুষকে বাবু লোক, ভদ্রলোক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করার মাধ্যমে প্রাকৃতজনকে অবজ্ঞা অবহেলা করা হয়েছে।

এই যুক্তির ভিত্তিতে মানুষকে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং সংস্কৃতি-চিন্তার অন্তর্নিহিত প্যাটার্নে যে ফ্যাসিবাদ শোষণবাদ আধিপত্যবাদ লুকিয়ে রয়েছে, যে শ্রেণী ও গোষ্ঠী শাসন লুকিয়ে রয়েছে তা বলা হয়েছে। এই ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামোগত চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে জীবনানন্দ দাশের এই উচ্চারণে যে, "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি;..." বাস্তবে এই তথ্য ও তত্ত্ব নিছক ও খণ্ডিত বাস্তবতাকে তুলে ধরলেও তত্ত্ব হিসেবে এর মধ্যে অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করার, প্রতিভাকে বিকশিত ও বিস্তারিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বড় মাপের শিল্প-সাহিত্য এবং সামাজিক কাজকে রবীন্দ্রনাথ-রাসেল প্রমুখের মধ্যে, বড় বড় নেতার মধ্যে সীমিত করে রাখা হয়েছে। এই চিন্তারই বর্ধিষ্ণু রূপ হিসেবে দেখতে পাই ১৯৪৬ সনে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চিন্তায়। এ সময় প্রকাশিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে তিনি "ধর্ম সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কালচার, কালচার শিক্ষিত মানুষের ধর্ম"—এই প্রবাদতুল্য বাক্যটির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অসংস্কৃত, অসভ্য, বর্বর, সম্ভাবনাহীন হিসেবে অভিহিত করছেন এবং একইভাবে সংস্কৃতিকে শহুরে শিক্ষিত অসাধারণ মানুষের মধ্যে সীমিত করে দিচ্ছেন। চিন্তার এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে আহমদ শরীফ আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। জীবনানন্দ ও মোতাহেরের চিন্তায় একটি গোষ্ঠীর অপ্রধানত্বের বিনিময়ে অন্য একটি গোষ্ঠীর প্রধানত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে সম্ভাবনাতত্ত্ব ব্যাহত হয়েছে।

শিক্ষা

জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে জান্নাতুল মাওয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছেন, আগের দিনে গুরু ধরে শিক্ষা নিতে হতো। সে সময় বিদ্যা ছিল 'অমূল্য ধন'। এখন আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান, স্রষ্টার জ্ঞান, ইহতত্ত্বের জ্ঞান, পরতত্ত্বের জ্ঞান, বাদ দিয়েছি। কিন্তু এখন সহজেই বিদ্যা কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আগে বিদ্যাশিক্ষা অর্থ ছিল ধর্ম শিক্ষা, এখন বিদ্যাশিক্ষা অর্থ হলো কারিগরি শিক্ষা। শিক্ষকেরা এখন স্কুলে ছাত্রদের পড়াশুনা করানোর চেয়ে কোচিং এবং কনসালটেন্সি করছে, ব্যবসা করছে। ছাত্ররাও 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' শিখছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতির মধ্যে গোলযোগ রয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যতীত ভাল সমাজ বা ভাল শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভব নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন : আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিমুখি ।

সাপ্তাহিক *খবরের কাগজে* ১১.৯.১৯৯৫ তারিখে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিন রকমের শিক্ষা অর্থাৎ আরবি, বাংলা এবং ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির বদলে প্রয়োজন একটি পদ্ধতি :

> এক এবং অভিন্ন, আধুনিক, উদার ও বিজ্ঞান-বাণিজ্য-সাহিত্য-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান সমন্বিত পাঠ্যসূচি -অনুগত শিক্ষাপদ্ধতি সার্বজনীন না করলে এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য না হলে আমাদের জাতীয় জীবনে সরকারি শিক্ষানীতি কেবল আমাদের কানাগলিরই সন্ধান দেবে—মানুষ হতে দেবে না।

আমরা দেখছি যে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি কানাগলিতে ঢুকেছে। এখন বিদ্যা বিক্রয়ের হাট বসেছে। এবং বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও কারো জন্যে ভর্তি নিষিদ্ধ নয় কিন্তু আসন সীমিত এবং ফি এতো বেশি যে কৃষক শ্রমিক তো দূরের কথা মধ্যবিত্তেরও নাগালের বাইরে। তা ছাড়া কয়েকটি কক্ষে একটি স্কুল বা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন হওয়ার ফলে একদিকে ক্ষুদ্রতা সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে সিলেবাসের রক্ষণশীলতা ও বাণিজ্যিকীকরণ আর এক ধরনের কানাগলিতে নিক্ষেপ করছে। রবীন্দ্রনাথের তপোবন-এর কনসেপ্ট এসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান অনেক দূরে।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্ন মুখস্থ করা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রহসন চলে এবং সরকার কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে একে আরো উন্নত ও গ্রহণযোগ্য করে না, সে বিষয়ে তিনি জান্নাতুল মাওয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> সমাধান তো সরকার ইচ্ছে করলে একদিনেই করে দিতে পারে। কিন্তু করবে না। কারণ ছাত্ররা তাহলে আন্দোলন করবে। পক্ষে থাকবে না। একই কারণে ছাত্রদের সিট রেন্টও বাড়ানো হয় না। তাছাড়া ভোটেরও একটা ব্যাপার আছে। কেউ জনপ্রিয়তা হারাতে চায় না। মার খেতে চায় না। রেজিস্ট করতে চায় না। এ জন্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিসি ছাত্র গুণ্ডাদের সাথে বসে কন্ট্রাক্টরদের কাছে পাওয়া কমিশনের টাকা ভাগ বাটেয়ারা করে দেয়। বেআইনী অস্ত্র কারো আছে দেখা গেলে তার দীর্ঘকাল কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। অথচ এখানে সর্বক্ষণ যেসব অস্ত্র বহন করা হচ্ছে পুলিশ দেখেও তাদের ধরে না। আবার মাঝে মাঝে হল তল্লাশিরও প্রহসন চলে।

তিনি এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং এই মূল্যবোধের প্রবল সমালোচক। তিনি মনে করেন, শিক্ষার মূল বিষয় তিনটি : শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তাঁর চিন্তা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কৌতূহল জাগানো, মাধ্যমিক শিক্ষা বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধ সঞ্চার এবং উচ্চতর শিক্ষা বৃত্তিমূলক হওয়া দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচাইতে বেশি। তিনি ছিলেন মহান শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ।

বুদ্ধিজীবী বিদ্যুৎসমাজ

৭.১১.১৯৯২ তারিখে *সাপ্তাহিক সেবা* পত্রিকায় মুহম্মদ শামসুজ্জোহাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ঢাকার বুদ্ধিজীবী, বিদ্যুৎসমাজ এবং তাদের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর চিন্তা অনুযায়ী, ইনটেলিজেনশিয়া হলো মনীষী, যে কোনো শিক্ষিত সাফ কাপুড়ে লোক, এডুকেটেড হোয়াইট কলার পারসন, সাধারণ অর্থে শিক্ষিত মাত্রই বুদ্ধিজীবী। "এই সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ প্রয়োগে

আমরা সহজেই বলতে পারি উচ্চমার্গের আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও সৃষ্টিশীল, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রমুখ অনন্য ও অসামান্য শক্তিধররাই মনীষী বা ইনটেলেকচুয়াল।"

তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডহীনতার কারণ হিসেবে তাদের দু'হাজার বৎসরের আর্থিক দৈন্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের লক্ষ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা। ২২.১১.১৯৭৪ তারিখে *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বুদ্ধিজীবীরা তিন শ্রেণীর—সরকার ঘেঁষা, সরকার ভীরু ও সরকার শত্রু। সরকার শত্রু শ'তে একজন।

বদরুদ্দীন ওমর আহমদ শরীফ প্রসঙ্গে তাঁর 'অধ্যাপক আহমদ শরীফ' রচনায় লিখেছেন, এখানে বিদ্বৎসমাজে আহমদ শরীফের অবস্থান স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

> ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত লোকজনের শতকরা নব্বই ভাগ, কি তারও বেশি হলো নানা রকম সুযোগসন্ধানী ও ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারকারী। শিক্ষিত অংশের মধ্যে এদের বিপুল প্রাধান্যের কারণে বাংলাদেশে বিদ্বৎসমাজ বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশের উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা যেসব 'গুণের' অধিকারী সেটার দ্বারা যে বিদ্বৎসমাজ গঠন হয়না এটা বলাই বাহুল্য।
>
> এদিক দিয়ে আহমদ শরীফ ছিলেন এক মস্ত ব্যতিক্রম। তাঁর মতো ব্যক্তিদের দ্বারাই গঠিত হয় যে কোন দেশের বিদ্বৎসমাজ। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা এতই নগণ্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করলেও তারা একত্রে এদেশে কোনো বিদ্বৎসমাজ গঠন করেন এমন বলার উপায় নেই।

সংবাদপত্রের ভূমিকা : ইতিহাস বিকৃতি

১১.৩.১৯৮৬ তারিখে *দৈনিক পূর্বকোণে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "সংবাদপত্রগুলো স্বার্থবাজ মালিকদেরই হাতে এবং সাংবাদিকরা চাকুরে বলে স্বাধীনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে কিছু লিখতে পারে না।"..... অথচ "আমার মতে, সংবাদপত্র দেশের গণমানবের স্বার্থে গণমানবের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত।" ৪.৭.৯৩ তারিখে *বাংলাবাজার পত্রিকায়* চৌধুরী জহিরুল ইসলামকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শহীদদের সংখ্যা বিষয়ে কর্নেল আকবরের কথাই ঠিক অর্থাৎ শহীদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ নয়, ৩ লক্ষ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করছেন না। তিনি সঠিক বাস্তবতা জানতে চাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের সরকারি ইতিহাসখানায় সরকারি ইতিহাসকাররা যেসব ইতিহাস রচনা করেছেন তা আমাদের জাতির উপর মামদো ভূতের মত চেপে রয়েছে। ইতিহাস বিকৃতি দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কি প্রয়োজন? অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে, এর জন্য একটি বোর্ডের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করতে হবে। ছাত্রদের, শিক্ষকদের এবং জনগণকে সঠিক ইতিহাস অবহিত করতে হবে এবং ইতিহাস আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বিভিন্ন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেবে।

পতিতালয় উচ্ছেদ

৯.২.৯২ তারিখে *সাপ্তাহিক প্রিয় প্রজন্ম* এর জন্য বিপ্লব রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশের বৃহত্তম নারায়ণগঞ্জের পতিতালয় উচ্ছেদ বিষয়ে তিনি বলেন,

> সমাজ পরিবর্তন না করে, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য রাষ্ট্রের বা সরকারের—এই সত্য স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত, আমাদের এই গতানুগতিক সামাজিক জীবনে পতিতালয় উচ্ছেদ সম্ভব নয়, স্বাভাবিক নয়, এমনকি বাঞ্ছনীয়ও নয়। কাজেই নারায়ণগঞ্জের পতিতালয় উচ্ছেদে যে শাস্ত্রীয় নীতি কপচানো হচ্ছে, তা স্বার্থপর সুবিধাবাদী-মতলববাজের কপটতাজনিত যুক্তিমাত্র। এই পতিতালয় উচ্ছেদকে আমি অত্যন্ত অমানবিক অন্যায় বলে মনে করি।

মৌলবাদ

মৌলবাদ বিষয়ে তিনি প্রথমা রায় মণ্ডলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মৌলবাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ভাল :

> শাস্ত্রের মূল শিক্ষার বা বাণীর বা দেশনার অনুগত থাকাই হচ্ছে মৌলবাদ। এখন রাজনৈতিক কারণে মৌলবাদ—ধর্মান্ধতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্দেশক হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ শব্দ এখন নিন্দা, ঘৃণা ও ধিক্কারব্যঞ্জক। শব্দটির উৎপত্তি ইংল্যান্ডে হলেও কাজে লাগিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদীরা মৌলবাদকে পুষ্ট করে সফল হয়েছে এবং মৌলবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রকৃত চরিত্র শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছে যে, যারা সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে সৈনিক হবেন, নেতা হবেন তারা আজ গুটিকয়েক কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং বেতনভুক ধর্মব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লড়াই করে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করছেন, দেশের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করছেন। স্পষ্টত গত দুই দশকে বাংলাদেশে মৌলবাদবিরোধী রাজনৈতিক, সামাজিক ও এনজিও কর্মকাণ্ড যতো ব্যাপক হয়ে উঠেছে, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনও সেই পরিমাণে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

অবশ্য এবিষয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আজকের দিনের যন্ত্রনির্ভরতা ও বিজ্ঞাননির্ভরতা মানুষকে ভাষা গোত্র গোষ্ঠী অঞ্চল-ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে যার ফলে মানুষ প্রথমত হচ্ছে 'স্বসত্তার মূল্য ও মর্যাদাবোধে' উদ্দীপ্ত। তাই তারা এই সব অর্থাৎ ভাষাগত, গোত্রগত, গোষ্ঠীগত, অঞ্চলগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দাবি করছে।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সমাধান কী? সমাধান হলো, নিজের ভাষাপ্রেমিকের ক্ষেত্রে বহুভাষাবিদ হওয়া, নিজের অঞ্চল গোত্র-গোষ্ঠী-প্রেমিকের ক্ষেত্রে এই সব সীমাবদ্ধতা বজায় রাখা আবার একই

সঙ্গে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আন্তর-অঞ্চল, আন্তরগোত্র, আন্তরগোষ্ঠী সেতুবন্ধন রচনা করা। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে শিথিল কনফেডারেশন। সংস্কৃতির সার্বিক ক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকারে নিজের উত্তরাধিকারকে সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট, সম্পৃক্ত এবং সহযোগী করা। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় আচার আচরণে, পালা পার্বণে অনুষ্ঠানে সেক্যুলার হওয়া, ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

এখানে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর সারা বিশ্বে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে যে দৈন্য সৃষ্টি হয় এবং নতুন করে পুরানো বিশ্বাস কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেই ধারায় এদেশেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদে মৌলবাদী শক্তি তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর বিরুদ্ধে একদল মানুষ আন্দোলনেও নেমেছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এ ব্যাপারে তার এক প্রবন্ধে বলেছেন, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সংস্কার থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন মানবিক মানসিক শুশ্রূষা, আঘাত নয়।

বাংলা ভাষা

১৯৭৩ সনে *দৈনিক সংবাদ, গণকণ্ঠ, হলিডে* পত্রিকায় কয়েকটি সাক্ষাৎকার দেন তিনি। এই সব সাক্ষাৎকারে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, এদেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে। কিন্তু অফিসে, শিক্ষায়তনে বাংলা চালু নেই। কারণ বই নেই। এছাড়া শিক্ষক এবং অফিসার যারা আছেন তারা বাংলায় অভ্যস্ত নন। তবে তারা ক্রমে ক্রমে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবেন। বাংলা ভাষা প্রচলনে অসুবিধার মধ্যে একটি হলো, টইপ রাইটার মেশিন নেই। আর একটি হলো পরিভাষা নেই। বলা যেতে পারে, সত্তরের দশকের প্রথম দিককার এই সব সমস্যা থেকে আমরা বর্তমানে কিছুটা উত্তীর্ণ হয়েছি। এই সাক্ষাৎকারে তৎকালীন ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যচিন্তা : সুকান্ত, সমাজতন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ

৫.৮.১৯৭৩ তারিখে *দৈনিক সংবাদে* রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এক সাক্ষাৎকারে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত মানবতার কবি। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসন চান। কিন্তু অগ্রসর সমাজের ও অগ্রসর সমাজ চেতনার আলোকে শ্রেণীশাসনের আসলে কোনো সমাধান রবীন্দ্রনাথে নেই। তাঁকেই যদি রাজনৈতিক আদর্শের গুরু ধরতে হয় তবে আমাদের বুর্জোয়া গণতন্ত্র কামনা করতে হবে যেখানে আমরা চাইছি সমাজতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তাঁর এই সাক্ষাৎকার এবং ৮.৫.১৯৭৩ তারিখে *বাংলাদেশ টেলিভিশনে* অনুরূপ ধরনের মন্তব্য করা এবং এরই বর্ধিত রূপ হিসেবে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রউত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধ বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। ১২.৮.৭৩ তারিখে *সংবাদে* দাউদ হায়দারকে প্রদত্ত আর একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কবি শিল্পী হিসেবে নয়, সমাজবাদ কায়েমের সৈনিক হিসেবে সুকান্ত উল্লেখযোগ্য। সুকান্ত

কেজো কবি। তিনি বামপন্থী। এই সব সাক্ষাৎকার, আলোচনা এবং প্রবন্ধে আহমদ শরীফের নিস্তাবক, বাস্তববাদী, সমাজবাদী এবং ঐতিহাসিক সাহিত্যচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

অবাধ মেলামেশা

১.২.৭৪-এ *দৈনিক বাংলায়* এক বোমা ফাটানো সাক্ষাৎকার দেন তিনি। তিনি এতে বলেন, তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। তবে শালিনতা থাকতে হবে। জৈবিক চাহিদা দমন করতে পারলে মানুষের অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে। তাঁর এই সাক্ষাৎকার শুধু বিজ্ঞানসম্মতই ছিল না, তা এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন তরুণ-তরুণীর মনে একদিকে উত্তেজনা এবং অন্যদিকে সংস্কার থেকে মুক্তির আশার আলো ছড়িয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারের কয়েকটি প্রতিক্রিয়া সে সময়ের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ৪.২.৭৭-এ এফডিসিতে একটি ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, চলচ্চিত্রে আমি চুমু পছন্দ করি। আজকের দিনে এ দুটি বিষয়ে পরিস্থিতি অনেক সহজ হয়েছে এবং আরো হবে বলেই মনে হয়।

মুক্তচিন্তার জন্যে লড়াই

১৭.৬.১৯৭৩-এ *হলিডে* পত্রিকায় তিনি নওশাদ আল খায়েরকে একটি দুঃসাহসী সাক্ষাৎকার দেন। এটা ছাপা হয় Free Thought Crucified শিরোনামে। এ সময় তিনি বলেন, মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ নেই, পরিস্থিতি রুদ্ধশ্বাস। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকারের অনুধাবন করা প্রয়োজন, বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সকলেই সব সংবাদ জেনে যায়।

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, আইন সাহায্য এবং মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন

১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের কথা অনেকেরই মনে আছে। এ সময় ৪ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৌলিক মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তিনি এই অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় ২০.১১.১৯৭৪ তারিখে *গণকণ্ঠের* প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তৎকালীন দেশের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ দেন। তিনি বলেন, অতীতের আন্দোলনের অসম্পূর্ণতার কারণে বর্তমানে দেশের মানুষ বিপর্যস্ত। নতুন মধ্যবিত্ত রাতারাতি ধনী হচ্ছে মজুতদারী চোরাকারবারী পারমিটবাজী মুনাফাখোরীর মাধ্যমে। দেশব্যাপী লুটপাট ও ভয়াবহ পরিবেশ। গুম-খুন-হত্যা। সন্ত্রাস। মৌলিক অধিকার হরণ। ২ কোটি মানুষ সর্বস্বহারা। এই বিপজ্জনক অবস্থায় কী প্রয়োজন?— "বর্তমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ও লক্ষ কোটি মানুষকে অনিবার্য ধ্বংস ও মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন সংগঠন এবং মানবদরদী দেশপ্রেমিক সংবেদনশীল মানুষের নেতৃত্বে এবং দেশপ্রেমিক বিভিন্ন শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতায় সর্বব্যাপী আন্দোলন।" অর্থাৎ তিনি এই বক্তব্যের মাধমে স্পষ্টত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন।

এসময় সমাজের ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি গঠিত হয় যার একটি সময়পর্বের সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সনের ৩০ মার্চ তারিখে সংগঠনটি গঠিত হয়। ২২.১১.১৯৭৪ তারিখে *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* প্রদত্ত সাক্ষাৎকারটি ছিল সম্পূর্ণরূপে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক একটি রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার। এতে তিনি বিশেষ করে বলেন, আমাদের মতো দেশে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শাসকেরা অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং মৌলিক অধিকার হরণ করে। এখানে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী এবং বিবেকবান ছাত্রের সংখ্যা অল্প হওয়ায় এবং তাদের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ক্ষীণ হওয়ায় তারা অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন। ফলে শাসক গোষ্ঠী তাদের দমনও করতে পারে দ্রুত। রাজনীতিবিদরা গণস্বার্থের ধ্বনি দেয় কিন্তু নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত থাকে। কাজেই সাধারণ মানুষের গণ-আন্দোলনই একমাত্র পথ।

জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন

২.২.১৯৭৭ তারিখে *উত্তরায়ণি* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের উপর ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সমবেতভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সনে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নতুন সংকল্পে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে একুশে উদ্‌যাপন কমিটি তৈরি হয় যার সভাপতি ছিলেন তিনি।

১১.৩.৭৭ তারিখে *দেশবাংলায়* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হামলায় বাংলাদেশের বিপন্নতার কথা বলেন। এসময় একটি মহল জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের কথা বললে তিনি তাদের ছদ্মবেশী মিত্র হিসেবে অভিহিত করেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি ১৫ আগস্টের পরিবর্তন বিষয়ে বলেন :

> ১৫ই আগষ্টে যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে দেশের জনগণ উল্লাসের সাথে গ্রহণ ও অভিনন্দিত করেছে। ত্রাস ও নির্যাতনের যে দুঃশাসন ১৫ই আগস্টের পূর্বে চালু ছিল তাতে মানুষের জানমাল ও গর্দান নিরাপদ ছিল না। মানুষ ছিল অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারের লুটেরার শিকার। তাই তারা এই পরিবর্তনে উল্লাস ও স্বস্তিবোধ করেছিল। তাই বলে সুদূরপ্রসারী সুফলপ্রসূ কোনো পরিবর্তন বলে তারা মনে করেনি। কেননা তারা অভিজ্ঞতা থেকে জানে ও মানে এই যুগে জনগণের সম্মতিক্রমে জনপ্রতিনিধি গণ-প্রবর্তিত আইনের শাসনে জনগণকে জীবনে ও জীবিকার নিরাপত্তার আশ্বাস দান করতে পারে।

আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব

১৯.৮.১৯৯১ তারিখে *সাতদিনের পূর্বাভাস* পত্রিকায় আমিনুর রশিদ ও আদিত্য কবিরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেন :

জাতির পিতার ধারণাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।... ৬৯-এর গণ-আন্দোলনের শুরু থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের একচ্ছত্র জনপ্রিয় নেতারূপে ঘোষিত এবং অঘোষিতভাবে প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠেন এবং মুক্তিযুদ্ধটা তার নামেই তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ঘটেছিল। এতো বড় সর্বজনপ্রিয় নেতা এর আগে ব্রিটিশ ভারতে বা পরবর্তীকালে উপমহাদেশে কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু শেখ মুজিবের শাসনামলে রক্ষীবাহিনীর এবং আওয়ামী লীগারদের গায়ে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে গণপীড়নমূলক নানা অবাধ অপকর্ম, দুর্নীতি এবং কারা-মারা-হানার ফলে মুজিব শাসনকাল সাধারণভাবে গণধিকৃত হয়। ফলে তার জনপ্রিয়তাও নষ্ট হয়ে যায়। একারণেই আজো তিনি সর্বসম্মতিক্রমে জাতির জনক আখ্যায় ভূষিত হতে পারেননি।... মুজিব নিহত হন বাকশালী হিসেবে। বাকশাল তার আদর্শ ছিল। আওয়ামী লীগ সেই আদর্শ থেকে সরে এসেছে। বাকশাল—সে আদর্শ ধরে হয়েছিল।

বাকশালের বাস্তব ভিত্তি কি ছিল এবং তার সম্ভাবনাও বা কি ছিল তা বিশেষভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

৯.২.৯২ তারিখে *সাপ্তাহিক প্রিয় প্রজন্মে* বিপ্লব রহমানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বর্তমান আওয়ামী লীগ হচ্ছে, আমার ধারণায়, শেখ মুজিবের নীতি-আদর্শরিক্ত এবং দৃঢ় নীতি আদর্শহীন, সুবিধাবাদী এবং সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক দল।"

২২ ও ২৭.২.১৯৯৪ তারিখে আবুল আহসান চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে :

শেখ মুজিব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যর্থ। জননেতা হিসেবে হি ওয়াজ দ্য হিরো—ন্যাশনাল হিরো। হি কুড গিভ অ্যান ইমেজ—যেটার প্রেরণায় তোমার মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব হলো।... নারী শিশু নির্বিশেষে পারিবারের সবগুলোকে হত্যা করা একেবারে বর্বরতা—অমানবিক বর্বরতা। শেখ হত্যাকাণ্ডটা অত্যন্ত বর্বরতা। আর শুধু ব্যাপার এটা নয়, অকৃতজ্ঞতাও। এই জন্যে মুজিবকে যদি সরাতেই হতো তাহলে উচিত ছিল মুজিবকে শুধু ধরে নিয়ে অজ্ঞাতবাসে পাঠানো। কারণ বাঙালি তার কাছে এতো কৃতজ্ঞ যে তাকে হত্যা করা উচিত নয়।...

জিয়া, বিএনপি

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে ১৯.৮.১৯৯১ তারিখে আদিত্য কবির ও আমিনুর রশিদকে দেওয়া পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,

আমি জানি যে, কর্নেল তাহের জিয়ার গৃহবন্দিত্ব মোচন করে আসন্ন মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং দেশের রাষ্ট্রনায়ক বানিয়েছিলেন। লোকমুখে শুনেছি তার বিরুদ্ধে ২০/২২ বার সেনা বিদ্রোহ ঘটে। নির্বিচার এবং গোপন হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি তা দমন করেন। আর্থিক ব্যাপারে জিয়া নিজে সৎ ছিলেন, কিন্তু অন্যদের দুর্নীতি করতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তার সময় সারা দেশব্যাপী দুর্নীতি ছিল।

১৫.২.১৯৮৫ সনে হুমায়ুন আজাদকে *বিচিত্রায়* দেওয়া সাক্ষাৎকারে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ও দেশ শাসন-যে অন্যায় ও অনধিকার-প্রসূত সে কথা উল্লেখ করেন :

> সশস্ত্র বাহিনীর দেশ শাসনের কোনো অধিকার নেই। বাড়ি পাহারার জন্যে যেমন পাহারাদার থাকে, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্যে যেমন পুলিশ পাহারাওয়ালা থাকে, দেশের সীমা পাহারা দেয়ার জন্যে তেমনি সামরিক পাহারাওয়ালা থাকে। তারা সরকারি চাকুরে; দেশের শাসক হয়ে বসার কোনো অধিকার তাদের নেই। যেহেতু তাদের হাতে অস্ত্র আছে, তাই গায়ের জোরে দেশ দখল করেন।

ঘাতক দালাল জামাত শিবির

১৯ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন এর উপদেষ্টা। ২৬ মার্চ ১৯৯২ ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গঠিত গণ আদালত-১এর অন্যতম বিচারক ছিলেন তিনি।

পাক্ষিক আনন্দপত্রে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে (১২-১৮ মার্চ প্রকাশিত) ইনামুল হক ইনুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সম্পর্কে বলেন. "মুজিব তাদের ক্ষমা করেছেন, জিয়া তাদের চাকুরি দিয়েছেন, পুনর্বাসিত করেছেন। আর এরশাদ তাদের সংগ্রামী জনতার ঘাড়ে বসিয়েছেন।"

১৯.৮.১৯৯১ তারিখে আমিনুর রশিদ ও আদিত্য কবির গৃহীত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন :

> জামাত কোনো বড় ঘটনা নয়। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ধর্ম মৃত। বর্তমান পৃথিবীতে তার উত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। জামাত স্থানীয়ভাবে মারামারি কাটাকাটি করতে পারে। তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা নেই। তারা কখনো ক্ষমতায় যেতে পারবে না। বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশ মুসলমান। জামাত ভোট পেয়েছে ১৮ শতাংশ—বাংলাদেশের লোক আল্লাহ-কোরানের কথা বলার পরেও ধর্মান্ধ জামাতকে ভোট দেয়নি।

সাপ্তাহিক আগামী পত্রিকায় ১৩.৫.৮৮ তারিখে ইয়াহিয়া মির্জাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ব্যাপারে বলেন,

> এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার নামান্তর বলে মনে করি।... (বুর্জোয়া দলগুলো) জামাত শিবিরকে নির্দ্বিধায় ও নীরবে সহযোগী করে নিয়েছে। এবং জিয়া নিজেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে গর্ববোধ করলেও স্বাধীনতার শত্রু রাজাকারদের সঙ্গে দুঃশাসন চালাবার জন্য শাসনতন্ত্রে 'বিসমিল্লাহ' বসালেন এবং রাজাকারদের মন্ত্রী বানালেন তখন মুক্তিযোদ্ধারা দল-মত নির্বিশেষে কেউ প্রতিরোধ করেননি। বরং মন্ত্রী হওয়ার প্রবৃত্তিতে নানা মতলবে বহু বহু মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার পদলেহন করেছিলেন। আজ এতকাল পরে রাজাকারদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা কিংবা বিক্ষুব্ধ চিত্তে তাদের শত্রু ভাবা কপটতার নামান্তর বলেই আমার মনে হয়। কেননা শেখ মুজিব ক্ষমা করার পরে রাজাকারদের প্রতিরোধে প্রয়াসী হতে কাউকে দেখিনি।

কাজেই তিনি মনে করতেন, সুবিধাবাদী, বুর্জোয়া, আমলা-সামরিক আমলা-ব্যবসায়ী-ধর্মান্ধ সরকারে দেশের মানুষের কোনো কল্যাণ নেই।

সর্বহারা পার্টি, সিরাজ সিকদার

আদিত্য কবির ও আমিনুর রশিদকে দেওয়া পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "ওরা (সর্বহারা পার্টি) হচ্ছে একটা গুপ্ত বিপ্লবী দল। তারা রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল। সর্বহারা পার্টি ছিল একটা সুসংঘবদ্ধ দল। তারা বিপ্লবের কথা বলতো।... সর্বহারা পর্টির মধ্যে এখনো বিপ্লবী আছে। তারা ডাকাতি করে না। ডাকাতরা ডাকাতি করে সর্বহারা পার্টির নামে শ্লোগান দেয়...।" উল্লেখ্য, সিরাজ সিকদার সম্পর্কে তিনি কয়েকটি সভাতে বক্তব্য দিয়েছেন। যেমন, ২.১.৮৫ তারিখে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত সিরাজ সিকদারের ১০ম মৃত্যুবার্ষিকীর সভায় তিনি বলেন, সিরাজ সিকদার মানুষকে ভালবেসে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাকে স্মরণ করার অর্থ হলো মেহনতি মানুষের সংগ্রামে নতুন করে শপথ নেওয়া।

একমাত্র পথ : মার্কসবাদ

২১.১২.১৯৭৯ তারিখে *সত্যকথা* পত্রিকার জন্যে আলতাফ চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আজকের যুগে বাঁচতে হলে অনুপাতিক হারে কর্মের ও সম্পদের এবং উৎপাদনের সুষম বন্টনই একমাত্র পন্থা।

১৭.৫.৮৮ তারিখে *ঢাকা কুরিয়ারে* আর বখতিয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সমাজ না বদলালে কিছুই বদলাবে না। জুলাই-আগস্ট ১৯৯২ সংখ্যা *মাসিক মাটিতে* মারুফ রায়হানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের সুদিন আসবে আগামী প্রজন্মের কালে।

৭.১১.১৯৯২ তারিখে *সাপ্তাহিক সেবার* জন্য মুহম্মদ শামসুজ্জোহাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের ও মার্কসবাদের কোনো বিকল্প আজ অবধি নেই।

তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে, ১৯.২.১৯৯৯ তারিখে *ডেইলি স্টারের* জন্য জিয়াউল করিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেন, এখনো মার্কসবাদই বাঁচার এবং সমাধানের একমাত্র পথ।

এই সাক্ষাৎকারগুলি থেকে আমরা দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবার ব্যাপারে অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তিনি মনে করেন, সংগ্রামী ও বিপ্লবী যাঁরা দেশকে বাঁচাবার জন্যে লড়াইয়ে নামবেন, তাঁদের অভ্যুদয় ঘটবে আরো দু'এক যুগ পরে। তাঁরা দেশকে শ্রেণীশাসনের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের পথে।

সাপ্তাহিক সেবার জন্য দেয়া পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আহমদ শরীফ একজন প্রতিবাদী ও প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজে নিজের ভূমিকা বিষয়ে বলেছেন : "আমি জীবিকা অর্জনে জীবন যাপনের মতলব নিয়েই জীবন শুরু করি। কাজেই আমি আমার পরিবারের সেবার ব্রতই গ্রহণ করেছি

মাত্র। তবে একটা প্রাণী যেমন খাদ্য গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দিকে তাকায়, আমিও তেমনি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করার চেষ্টা করেছি। আমার সাধ থাকলেও অন্য কোনো সাধ্য ছিলনা বলে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে লেখার মাধ্যমে গণকল্যাণ-চেতনা জাগাবার চেষ্টা করেছি। আমার বিদ্যাবুদ্ধির মান উঁচু ছিল না বলে হয়তো লোকগ্রাহ্য কিছু লেখা সম্ভব হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, "আকাশেতে আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস, তবু উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।"